OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 133 - 139
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

লীলা মজুমদারের ভূতের গল্প : একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

সুবীর গোস্বামী
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID : gsubir94@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Leela Majumder, Ghost, stories, child, literature, moral, friendly.

Abstract
Ghost stories occupy a special place in Leela Majumder's literature. However, Leela Majumder's ghost story is a bit different from what we usually mean by ghost story. All the ghosts we meet in Leela Majumdar's stories are friendly ghosts. They do good if they can but never harm anyone. The ghosts in his stories are sometimes narcissistic. They make moral decisions. Sometimes these ghosts are active in suppressing the evil and sometimes they are interested in the observance of virtue.

Discussion

মানব জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় শিশু-কিশোর অবস্থা। এই শিশু-কিশোরদের মনের উপযোগী সাহিত্যকেই সহজ ভাবে বলা হয় শিশু-কিশোর সাহিত্য। বিশ্বের সকল সাহিত্যেই এই শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং সেগুলোতে উঠে এসেছে তাদের মনস্তত্ত্ব, অনুভব, কল্পনা বিলাসিতা, বিজ্ঞান সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতার চিত্র। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যত ‘সখা’ ও ‘সাথী’, ‘বালক’, ‘মুকুল’, ‘সন্দেশ’ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা প্রথম আমলের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ধারক ও বাহক। ১৮৮৩-১৯১৫-এই সময় পর্ব কে বাংলা শিশু সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রূপে চিহ্নিত করা যায়। কেননা এই সময় পর্বে বাংলা ভাষায় তিনটি প্রধান কিশোর পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। প্রমদাচরণ সম্পাদিত মাসিক ‘সখা’ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে। শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ এই পত্রিকাতেই। ১৮৮৫ সালে ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘বালক’ পত্রিকা। যেখানে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকে। যিনি ওই এক বছরের মধ্যেই ছোটদের জন্য লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ প্রায় সবকিছুই। ১৮৯৩ সালে ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত ‘সাথি’ পত্রিকার প্রকাশ। যা দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সখা পত্রিকার সঙ্গে একত্রিত হয় একই উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হতে থাকে ‘সখা ও সাথি’ নামে। যা বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে একটি মাইলস্টোন। ১৮৯৫-এ এসে আমরা পাচ্ছি ‘মুকুল’ পত্রিকা। এই 'মুকুল' আবিষ্কার করেছে সুকুমার রায়ের মত প্রথিতযশা শিশু সাহিত্যেককে। ‘মুকুল’-এর আগে ছোটদের পত্রিকায় এমন রাজকীয় উজ্জ্বল প্রকাশ কখনো ঘটেনি।কাগজ, ছাপা, ছবি, বর্ণ বিন্যাস, চিত্রসংস্থাপন এবং সর্বোপরি বিষয় নির্বাচন এবং

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখার গুনমানে শিবনাথের 'মুকুল' ছিল অতিশয় উন্নতমানের। পরবর্তী সময়ে আমরা পাচ্ছি মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ'। যা প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে, উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায়। এই 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্য চর্চা' গ্রন্থের 'শিশু সাহিত্য' প্রবন্ধে উচ্চারণ করেন - কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধা-সন্দেশের ভোজ্য তালিকায় এমন কিছু ছিলনা যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সহজ সমন্বয় ঘটেনি। এর পরবর্তী সময়ে আরো অনেক পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের বিকাশে আমরা যাদের নাম উল্লেখ করতে পারি তারা হলেন - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুলদাররঞ্জন রায়, প্রমদারঞ্জন রায়, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, সুখলতা রাও, সুবিনয় রায়, সুবিমল রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লীলা মজুমদার, কুসুর কুমারী দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ, আশাপূর্না দেবী, নবনীতা দেব সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের। যাদের রচনা সম্ভারে বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য আজ ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রায় চৌধুরী পরিবার। আর সেই পরিবারের সদস্যা লীলা মজুমদার বাংলা শিশু সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। লীলা মজুমদারের জন্ম ১৯০৮ সালের ২৬ ফিব্রুয়ারি কলকাতায়, ২২ নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে। পিতা প্রমদারঞ্জন রায় ও মাতা সুরমা দেবীর তৃতীয় সন্তান লীলার শৈশব অতিবাহিত হয় শৈলসহর শিলং-এ। পার্বত্য শিখরের সেই ছোট্ট জনপদের প্রাকৃতিক পরিবেশটি ছিল তাঁর শৈশবের আশ্রয়। লীলা মজুমদারের শিক্ষা জীবন শুরু হয় ১৯১৪ সালে, লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে। তবে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই পিসতুতো বোন ময়নার জন্মদিনে পাওয়া এ-বি-সি ব্লক থেকে প্রথম ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে আর দিদি সুখলতা রাও এর কাছ থেকে পাওয়া উপহার 'হাসিখুশি' ও 'মোহনভোগ' বই দুটির মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। শিলং-এর লোরেটো কনভেন্টে বাংলা পড়ার সুযোগ না থাকলেও বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আখ্যান মঞ্জরী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠের মধ্য বাংলা শিক্ষার শুরু লীলা মজুমদারের। শৈশবেই লীলা মজুমদারের পরিচয় হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম হ্যান্স অ্যান্ডারসনের গল্প বা গ্রিম ভ্রাতাদের রূপকথার গল্পের সঙ্গে। সেই সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশ তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সঙ্গে।

লীলা মজুমদারের সাহিত্যের একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে ভূতের গল্প। তবে সাধারণত ভূতের গল্প বলতে আমরা যা বুঝি লীলা মজুমদারের ভূতের গল্প সেই ভাবনা থেকে কিছুটা পৃথক। বিধাতার মঙ্গল বিধানে লীলা মজুমদার ভরপুর আস্থা রাখেন আর তাই তাঁর গল্পের ভূতেরাও নিপাট ভালো মানুষ। তাঁর ভূতেরা দৈনন্দিনতার স্বাভাবিকতায় আচ্ছন্ন। 'সব ভূতুরে' সংকলনের ভূমিকায় তাঁর মন্তব্য, -

> "বিধাতার মঙ্গল বিধানে আমার আস্থা আছে, তাই আমার এই ভূতেদের একটু সুনজরে দেখতে হবে।"[১]

লীলা মজুমদারের গল্পে আমরা যে সকল ভূতের সাক্ষাৎ পাই তারা বন্ধু ভূত। সাধ্যের মধ্যে থাকলে তারা উপকার করে কিন্তু কখনোই কারো ক্ষতি করে না। তাঁর গল্পের ভূতেরা কখনো নাতিবাদীও বটে। তারা নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়। এই ভূতেরা কখনো দুষ্টের দমনে তৎপর আবার কখনো শিষ্টের পালনে আগ্রহী। লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পের মধ্যে 'আহিরীটোলার বাড়ি', 'তেপান্তরের পারের বাড়ি', 'চোর', 'অহিদিদির বন্ধুরা', 'অশরীরী', 'পিলখানা', 'ছায়া', 'ভয়', 'হারু হরকরার একগুয়েমি', 'সন্ধ্যা হল', 'লাল টিনের ছাদের বাড়ি', 'পাঠশালা', 'তেজো', 'কলম সর্দার' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

'ভূতের বাড়ি' গল্প সংকলনের ভূমিকায় লীলা মজুমদার তাঁর সমস্ত লেখার মূল কথাটি তুলে ধরেন। গল্প গুলোর মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোর জীবনে মানবিক হওয়ার বার্তাটি ধ্বনিত হয়। ভূমিকায় লীলা মজুমদার বলেন, -

> "এই সব অসত্য অশরীরীদেরও বলবার কিছু কথা আছে। সে কথা হল দয়া বড় ভালো জিনিস।"[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

-তাঁর গল্পের ছত্রে ছত্রে এই মানবিক দিকটির কথা উঠে আসে। 'ভূতের বাড়ি' সংকলনের 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পটির মধ্য দিয়ে আমরা সেরকমই একটা চিত্র দেখতে পাই। গল্পে অহি দিদির স্বামী সুরেন বাবু অবসর নেবার পর কোনো এক অজপাড়াগাঁয়ে নতুন খোলা হাতের কাজ শেখাবার বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হলে তার পরিবার অর্থাৎ মা ও স্ত্রী অহিদিদিও সেই অজপাড়াগাঁয়ে বসবাস শুরু করেন। সেই জায়গাটা একসময় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাঁটি। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা মোটেই সন্তোষ জনক নয়। এই অঞ্চল জুড়ে বহু পুরোনো পোড়ো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আর দু-এক পরিবার ছাড়া কিছুই তাদের চোখে পড়ে না। সেই জনশূন্য অঞ্চলে চোরের ভয় নেই। ভুলবশত রাতে কিছু বাইরে থাকলে হারিয়ে যায় না বরং সকালে উঠে দেখা যায় কিছু লাভ হয়েছে। গল্পে অহিদিদি ভুলবশত একটা পেতনের ঘড়া বাইরে ফেলে রাখলে পরদিন সকালে তা গন্ধরাজ লেবুতে পরিপূর্ণ হয় আছে দেখে আশ্চর্য হন। এরকমই আশ্চর্য হন যখন তিনি দেখেন রান্না ঘরে রাখা দুধের সর এক পাশ থেকে খানিকটা কে ছিঁড়ে নিয়েছে, মেঝেতে টপটপ করে দুধ ফেলেছে; নতুন রং করা দেয়ালে ছোট ছোট আঙুল মুছেছে। কিন্তু আশেপাশে কেউ নেই। তবে অহিদিদি এই সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেন না। এরকম কখনো রান্না ঘরের ছাদে ঝাঁপি কাত হয়ে, মেঝেতে মাছ পড়ে থাকে, আর শিকেয় তোলা কিছু মাছ কমে যায় দেখে অহিদিদি বার বার আশ্চর্য হন। পরে এক সময় তিনি আবিষ্কার করেন এই নিরবান্ধব পুরীতে আট-দশটা রোগা ছেলে-মেয়েদের। যাদের গায়ে জামা নেই, চুল রুক্ষ। সেই ছেলেমেয়েরা অহিদিদির কাছে এসে খাওয়ার পায়, পরীদের দ্বীপের গল্প শুনে। তাই আর কখনো চুরি করে খাবার খেতে যায় না তারা। সেই ছেলে মেয়েদের মধ্যে শুধু একজনই কথা বলতে পারে যার নাম বগেশ। বগেশের কথায় অন্যরা 'জিবকাটা' তাই লজ্জায় কথা বলেনা। অহিদিদি সেই কথা শুনে হেসে লুটোপুটি খান আর বগেশকে জানান যে আসলে যারা বেশি কথা বলে তাদেরই জিবকাটা বলে। এরকমই তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অহি দিদি জানতে পারেন, পাশের আম বাগানের ঝুপড়িতেই তাদের ঘর। কিন্তু তারা বড্ড গরীব তাই খেতে পায় না, পৌষ পার্বনে পিঠে পুলিও তাদের ভাগ্যে জোটেনা। অহি দিদি সেই বাচ্চাদের পৌষ পার্বণে গোকুল পিঠে, পাটিসাপটা, নারকেল নাড়ু ইত্যাদি করে খাওয়ান এবং জানান আর হয়তো তাদের সঙ্গে তার দেখা হবে না, কথা হবে না। কেননা সপরিবারে অহিদিদিরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন। উত্তরে বগেসও জানায় –

> "মোরাও থাকবো নি মা, মোরাও চলে যাব।"[৩]

সেই নির্বন্ধব পুরীতে যে কয়টি শিশুর সঙ্গে তার স্নেহের বন্ধন তৈরি হল তাদের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের ভাবনায় তার মনে কষ্ট হল এবং তিনি শেষবারের মতো নতুন বাড়িতে চলে যাবার আগে বগেশের বলা তাদের ঠিকানা অর্থাৎ আম বাগানে গিয়ে দেখেন সেখানে কারো বসত বাড়ি নেই। একেবারেই জনশূন্য সেই অঞ্চল। তাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি তাদের আরেকবার দেখতে পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে একটা রিকশা নিয়ে তার নতুন কোয়ার্টারে গিয়ে উঠলে গয়লা বউয়ের কাছে যা শুনেন তাতে রীতিমতো অবাক হতে হয়। গয়লা বউ জানায়, -

> "এবার নতুন বাড়িতে উঠে এসেছ এখন বললে দোষ নেই। কী করে পাঁচ মাস ওই হানাবাড়িতে কাটালে মা, ভেবে পাই নে। সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকেরা ও-তল্লাটে যায় না জিবকাটাদের ভয়ে।"[৪]

- কে এই জিবকাটা, অহি দিদি জানতে চাইলে গয়লা বউ জানায় দুশো বছর আগের এই অঞ্চলের কোন এক সদাগরের প্রচণ্ড অমানবিকতার কাহিনী। সে বলে, -

> "ওই বাড়িটা ছিল এক মস্ত সদাগরের। একবার ভোর বেলায় গয়লাদের ছেলে-মেয়েরা পৌষ পার্বণের বাঁশি পিঠে খেতে এসে এমনই হট্টগোল করছিল যে কর্তা তাদের ন-জনের জিভ কেটে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়টা পালিয়েছিল।"[৫]

আমরা এতক্ষণে অনুমান করতে পারি সেই সবচেয়ে বড়টা আসলে এই খগেশ। যে সকলের হয়ে এতদিন কথা বলছিল অহি দিদির সঙ্গে, আর পেয়েছিল স্নেহের পরশ। গল্পের শেষে তাই দেখি যে আমবাগানে দুশো বছর থেকে কোন বোল ধরেনি সেখানেও গাছে গাছে নতুন বোল আসে। সমস্ত নির্মমতার অমানবিকতার বিপরীতে লীলা মজুমদার মূলত শিশু কিশোরদের গড়ে তোলার প্রয়াসী আর তাই তাঁর গল্প মানবিক হতে শেখায়। গড়ে তুলতে চায় এক সুস্থ-সুন্দর পৃথবী।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একই সংকলনের 'চোর' গল্পে এক হিরে চোরকে দু-শো বছরের কালী ভক্ত ভূত চোরের যাবতীয় অতীতের গ্লানি মিটিয়ে দিয়ে সঠিক পথে চালিত হওয়ার শক্তি জোগান। আর চোরও সাদামাটা জীবন যাপন করতে গ্রামে তার মার কাছে ফিরে যায়। 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পে যেমন ভূতের প্রতি মানুষের বাৎসল্যের, উপকারের একটা দিক লক্ষিত হয় 'চোর' গল্পেও তেমনি ভূত কর্তৃক মানুষের উপকারের দিকটিও লক্ষিত।

'গৌর পাহাড়ে গৌতমরা' গল্পটি একাধারে রহস্য, অভিযান ও ভৌতিক গল্পের সংমিশ্রণ। পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করা গৌতম ঘটক ইকুস্থলে গিয়ে দরকার হলে মাটি খুঁড়ে দেশের প্রাচীন ইতিহাসের নানা তথ্য জানতে আগ্রহী। আর সেই আগ্রহেই গৌর পাহাড় অভিযানের সূচনা। এই গৌরপাহাড়ে দু-বছর থেকে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। একদিকে খাদ্যাভাব আর অন্যদিকে ভূতের ভয়ে এই অঞ্চলের অনেকেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যে গুটি কতক মানুষ সেই পাহাড়ে বর্তমানে অবস্থান করে তারা পুরোনো ঘটি-বাটি বিক্রি করতে সমতলে আসে। প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো এই সামগ্রী গুলো, পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করা গৌতমকে একটি দল গঠন করে সেখানে পৌঁছাতে ও অনুসন্ধান করতে আগ্রহী করে তোলে। কোন ধনরত্ন খুঁজে পাবার আশায় নয়, বরং জন্মভূমি সম্বন্ধে নতুন তথ্য সংগ্রহ করাই গৌতম ঘটকের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই অভিযানের অকুস্থলে সুজন নামে অপর একজন ব্যক্তিত্ব জুড়ে যান। যার নিজেরও আগ্রহ এই পুরাতত্ত্বে আর এই অঞ্চল সুজন বাবুর চেনা থাকায় তিনি হয়ে ওঠেন অনুসন্ধানে আসা দলটির অন্যতম সাহায্য কারী ব্যক্তি। তবে আরো একজন গাইড ঠিক করে দেয় উর্দিপরা হোটেলের বেয়ারা, যার নাম রবিলাল। এই রবিলাল সরকারের লোক। সে, অনুসন্ধানে আসা দলকে অকুস্থলে পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেলে গৌতমরা যখন অপূর্ব বনজ সৌন্দর্যের মধ্যে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠার রহস্য উন্মোচন করে সেই সময়ই আবার এসে হাজির হয় সুজনদা। গৌতম বাবু ও সুজনদার কথোপকথনে উঠে আসে অন্য একটি বাস্তব চিত্র। অনুসন্ধানে আসা দলটি বুঝতে পারে বুনো হিংস্র জন্তুর, বনে রহস্যজনক আলোর, ভূতের এত ভয় দেখিয়ে গ্রামের মানুষদের গ্রাম ছাড়া করার কারণটি তার কিছু নয় জেম আর টারকয়েজের মতো খনিজ সম্পদের চোরা কারবার। সুজনদা গৌতমকে জানায় অফিসে গিয়ে যেন তারা এই সমস্তই রিপোর্ট করে। তবে সেই রিপোর্ট যেন হয় মৌখিক। এই অঞ্চল থেকে লিখিত কোনা রিপোর্ট নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে বারণ করে সুজন দা। এই বারণ করার কারন সম্পর্কে সে বলে, -

> "লিখিত কিছু নিলে ঘরে ফেরার আগেই তোমরাও নিখুঁজ হয়ে যাবে, এই আমারই মতো।"[৬]

কথাটি বলে প্রসন্ন হেসে বড় বড় পা ফেলে অস্তগামী সূর্যের দিকে যখন সুজন রওনা দেয় গৌতমরা তখন আবিষ্কার করে সুজনদার কোন ছায়া পড়ছে না। আর গল্পটিও হয়ে ওঠে ভৌতিক।

লীলা মজুমদারের 'আষাঢ়ে গল্প' সংকলনের 'মৌ' গল্পেও আমরা এরকম এক ইঞ্জিনিয়ার ভূতের দেখা পাই যিনি পনেরো বছর আগে পরিতলার বাঁকে গাড়ি খাদে পড়ে যাওয়ার কারণে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই মৌ কানের একটি দুল চিহ্ন স্বরূপ সুভাষকে দিয়ে সে যেনো জনি চৌধুরীকে গিয়ে বলে যে এই হোটেল ধ্বসে পড়বে। আর তাই সবাইকে যেন অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জনি চৌধুরী এই কথা শুনে আর সময় নষ্ট না করে মৌ-এর বলা প্রত্যেকটি বাক্য পালন করলেন কেননা "মৌ বলেছে। তবে এর অন্যথা হবে না। ...মৌ একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিল।"[৭]

লীলা মজুমদারের গল্পে উপকার প্রবণ ভূতের সংখ্যা নেহাত স্বল্প নয়। তাঁর 'কলম সর্দার' গল্পে পুলিশের চাকরিতে নতুন যোগ দেওয়া ছোট ঠাকুরদাকে এক কুখ্যাত চোর কলম সরদারকে খোঁজে বের করতেও আমরা এমনই এক ভূতের সাক্ষাৎ পাই। 'লালটিনের ছাদের বাড়ি' গল্পটিতেও দেশ সেবার কাজে নিয়োজিত এক ভূতকে আমরা পাই। যে দেশের হানি করতে চাওয়া লোকদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আগে থেকে জানতে পারে এবং দেশীয় সৈন্যদের সতর্ক করে তাদের প্রাণ রক্ষা করে। এরকমই এক নীতিবাদী ও উপকারপ্রবণ ভুতের দেখা মেলে 'হারু হরকরার একগুঁয়ে মি' গল্পটিতে। এই হারু হারকরা মৃত্যুর পরও চিঠি বিলি করে বেরায়। বোলপুরের ভুবন ডাঙ্গার বাসিন্দা বড় দাদুর দাদা মশাই তার একমাত্র সন্তান অর্থাৎ বড় দাদুর মাকে এক প্যাকেট হিরে পাঠিয়েছিলেন যা অনেক বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রাপকের হাতে এসে পৌঁছায়নি। রেজিস্টার্ড ডাক হওয়া সত্বেও প্রাপকের হাতে না পৌঁছানোয় দাদু সমস্ত ডাকহরকরাদেরই চোর ভাবেন। এদিকে বড় দাদুর

একমাত্র নাতি বারো উটকো আর তার বন্ধু লঙ্কা হিরে হারানোর এই বিষয়টি হারু হরকরাকে জানালে হারু বলে যে চিঠিতে নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল ছিল না হলে চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছানোরই কথা। চিঠি পায়নি বলে ডাক হরকরাকে চোর বলা মেনে নিতে পারে না এই হারু। সে বলে তার নিজের কাছেই বহু পুরানো কিছু ডাক এমন আছে যার নাম, ঠিকানা ভালো করে চেনা যায় না। সেই সমস্ত ডাক সে দীর্ঘকাল বয়ে বেড়াচ্ছে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্যে। এই ডাকগুলো সঠিক জায়গায় না পৌঁছালে তার তৃপ্তি নেই। সেই জমানো ডাক থেকেই সে উটকোর দাদুর দাদুর নামটাই শুধু মিলিয়ে নেয় আর সেই ডাক উটকোর মাধ্যমে পৌঁছে দেয় তার যোগ্য প্রাপকের কাছে। তবে এখানেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সে অঙ্গীকার করে,-

> "এই যে রং ওঠা নাম-ঠিকানা-ধোয়া, ভুল নাম লেখা তেরোটা চিঠি বাকি রইল, এর পেরতেকটির মালিক খুঁজে বের করে তবে আমি ছাড়ব। তারপর ছুটি নেব।"[৮]

লীলা মজুমদারের 'তেজো' গল্পে একটি পশু ভূতের সাক্ষাৎ মেলে। এই তেজো আসলে এমন একটি কুকুর, যে বড়দের হিংসা করলেও ছোটদের বড্ড ভালোবাসে। খেলার সাথী শম্ভু-ই নবুকে এই তেজোর কথা জানায়। বনে জঙ্গলে যখনই মনে ভয় হবে তখনই তেজো বলে ডাকলে সে এসে হাজির হয়। সেই তেজোই এক সময় নবকে দুষ্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করে। পরবর্তী সময়ে তাদের নিজের কুকুর টাইগারকে নবু, তেজো হলে ডাকলে তার বাবা আর জ্যাঠামশাই আশ্চর্য হন কেননা এই তেজো ছিল তাদের বাবার কুকুর।

> "এই টিলার ওপরেই ঠ্যাঙারের হাত থেকে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল।"[৯]

এই তেজোর মৃত্যুতে গ্রামের ছেলে-মেয়ে সাত দিন কান্না করেছিল তেজোও সেই ভালোবাসা ভুলে যেতে পারে না, তাই আজও ছেলেমেয়েরা কোন বিপদের সম্মুখীন হলে সে এসে উপস্থিত হয় এবং তাদের রক্ষা করে।

'তেপান্তরের পারের বাড়ি' গল্পে একশো বছরের পুরনো একটা ভুতুড়ে বাড়িতে গিয়ে রাত কাটিয়ে, হরিনাম লিখে আসতে রাজি হয়ে যায় গুরু আর নটে নামের দুটি বালক কেননা –

> "ওখানে রাত কাটাতে পারলে, বাড়িওয়ালার বাড়ি বিক্রি হবে, কল্যাণ সংঘ সস্তায় ওটা কিনবে, কিনে ভেঙে ফেলবে, এক দঙ্গল লোক মজুরি পাবে। মিনি মাগনায় ইট-কাঠগুলো পাবে, নতুন বাড়ি উঠবে, মুটে, মজুর, মিস্ত্রি, ঠিকাদার সক্কলের কম-বেশি রোজগারপাতি হবে। যাদের কেউ নেই তারা সেখানে থাকবে, ইস্কুল হবে, কাঠের আসবাবের কারখানা হবে, বই বাঁধাইয়ের দোকান হবে, হাঘরেরা চাকরি পাবে আর- নটে-গুরুও দশ টাকা পাবে।"[১০]

গল্পের এই অংশ থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না লীলা মজুমদারের গল্প গুলোর শিশু-কিশোর চরিত্ররা জগত ও জীবন সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল। নিজের দশ টাকা উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরও যে ভালো হবে সেই বাড়িতে এক রাত কাটালে তা তারা জানে ।আর এই জানে বলেই এই কাজে তারা রাজি হয়। সেই ভুতুরে বাড়ি, যেখানে একশো বছর কেউ থাকেনি সুতরাং একেবারে জনশূন্য, খাঁ খাঁ সে বাড়িতে পৌঁছালে নটে আর গুরু দেখতে পায় সমবয়সী অনেক ছেলে-মেয়েদের। যারা নটের হাতে 'টিপিন' দেখে একটু খেতে চায় আর নটেও তাদের সেই টিপিন খেতে দেয়। হা-ঘরে ছেলে-মেয়েরা নটে-গুরুর টিফিন খালি করে দিয়ে সেই বাড়িতে আপ্যায়ন করতে গিয়ে বলে, -

> "আয় বাপ, ভিতরে আয়, আমাদের এত খাওয়ালি, তোরা আমাদের বন্ধু।"[১১]

- এই কথা বলা ছেলেমেয়েরা আর কেউ নয়। এক সময় না খেতে পেয়ে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পরা সেই শিশু-কিশোর যারা আজ একটু খেতে পেয়ে নটে-গুরুকে নিজের বন্ধু বলে সম্বোধন করে। আর তাদের হয়ে নিজেরাই বাড়ির সারা দেয়াল জুরে 'হরি নাম' লিখে দেয়। কেননা বাড়িতে হরিনাম লিখলে বাড়ি বিক্রি হবে। সেখানে গড়ে উঠবে আশ্রম আর সেইখানে থাকবে বাড়ি-ঘরহীন, খেতে না পাওয়া তাদেরই সমবয়সী শিশু-কিশোররা। তারা এই বাড়ি ছেড়েও অন্য কোথাও চলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যেতে রাজি হয়ে যায় কেননা তারা চায় তাদেরই মতো অন্য ছেলে-মেয়েদের যেনো না খেতে পেয়ে ভূতে পরিণত হতে না হয়।

'আহিরিটোলার বাড়ি' গল্পের খোকাবাবু গঙ্গার ধারে অবস্থিত বাড়িতে দেখা পায় পরলোকবাসী বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা শিবেন্দ্রনারায়ণ ও অঙ্ক বিশারদ কুট্টি বাবুকে। কুট্টি বাবু এমনই একজন অঙ্ক শিক্ষক যার বই দরকার হয় না, সবই তার 'মাথার মধ্যে ঠাসা'। সেই কুট্টি বাবুর কাছে অঙ্ক না জানা খোকাবাবু অঙ্ক শিখে উপকৃত হয়। সেই সঙ্গে একসময় টেস্ট পরীক্ষায় পনেরো পাওয়া খোকাবাবুর মনে ভালো ফল করার মতো আত্মবিশ্বাসও জাগ্রত হয়।

লীলা মজুমদারের গল্পে শুধু যে উপকারী ভূতের দেখা মেলে তা নয়, মানুষকেও অনেক সময় ভূতের উপকার করতে দেখা যায়। 'দামু কাকার বিপত্তি' এমনই একটা গল্প। গল্পে দামুকাকা ভূতেদের মধ্যে কে বেশি সুন্দর তার বিচার করে দিয়ে ভূতের ঝগড়া মেটাতে সাহায্য করেছিলেন। লীলা মজুমদারের 'ভয়' গল্পটিও আলোচনার দাবী রাখে। গল্পটি ভিন্নমাত্রিক 'ভয়' মূলত ভূতের গল্প হলেও গল্পে একদিকে রয়েছে অভাব অনটনের মধ্যে লেখাপড়া শিখতে গিয়ে অনেক কৃচ্ছ সাধনের কথা। পিতার পা কাটা যাওয়ার পর পেনশনের টাকায় সংসার চলে না বলে বঙ্কুকে দিনের বেলা ছাপাখানার কাজ করতে হয়। তার বন্ধু লখাও তা-ই। স্বভাবতই দিনের বেলা হাই স্কুলে তাদের যাওয়া হয় না ফলে তারা নাইট স্কুলে পড়তে যায়। কিন্তু সেখানে যেতে যে বনপথ অতিক্রম করতে হয় সেই বনে একসময়ের দুর্ধর্ষ ডাকাত ঘনার ভূতের ভয়ে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সেই ঘনার কবলে যে-ই যায় তার মৃত্যু ঘটে। এমনই এক রাতে বন্ধু লখার জ্বর হলে বঙ্কুকে একাই যেতে হয় নাইট স্কুলে। ক্লাস শেষ করে বাড়ি ফিরতে গিয়ে কোনো এক শিশুর কান্নার শব্দে সে ভয় পায়। ভাবে হয়তো ঘনার কবলে পড়তে চলেছে সে। মশাল হাতে যখন বঙ্কু সেই কান্নারত শিশুকে দেখতে পায় তখন তার ভয় কিছুটা নিরসন হয়। বনে থাকা কোন একটা ফাঁদের কাঁটায় বন্দী সেই শিশুটিকে রক্ষা করতে সেখানে তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হয় কপালে কাটার দাগ, লাল চোখ, বিকট চেহারার এক কালো কুচকুচে লোক। তার পরামর্শেই ছোট কান্নারত শিশুটি নিজের পা রক্ষা করতে সক্ষম হয়। বিকট লোকটি জানায়,-

> "আমার পা-টা কেউ বাঁচায়নি গো, আঙুলগুলো সব কাটা পড়েছিল।"[১২]

বঙ্কু দেখে তার ডান পায়ের একটাও আঙুল নেই। ততক্ষণে কাঠুরেদের ছোট্ট দুরন্ত ছেলেটির খোঁজে গ্রামের লোক আসে। তৎক্ষণাৎ সেই পরামর্শদাতাটিও উধাও হয়ে যায়। বঙ্কুর কোলে ছেলেকে পেয়ে বঙ্কুকে অনেক আশীর্বাদ করে তারা আর বলে,

> "বড় বাঁচিয়েছিস বাপ, ঘনার হাতে পড়লে আর দেখতে পেতাম না। ঘনা বড়ো ভয়ঙ্কর ...কাছে গেলে নিঘ্যাত মিত্যু! শুনেছি কালো কুচ কুচে, আর ডান পায়ে একটাও আঙুল নেই।"[১৩]

- শুনে বঙ্কুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। সে বুঝতে পারলো একটু আগে ছেলেটির প্রাণ বাঁচানো লোকটি এই ঘনা-ই। যে লোকটির ভয়ে গ্রামের সকলে ওষ্টাগত সেই লোকটি যখন একটি বাচ্চার প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসে, যা তার নিজের বেলায় কেউ করেনি। সে আর যাই হোক, ভয়ঙ্কর হতে পারেনা। আর এই কথাটি সে সকলে বলেও। বঙ্কুর কথায়, - 'ঘনা বড় ভালো, মোটেই ভয়ঙ্কর নয়'। এরপর থেকে ঘনাকে আর কেউ কখনো দেখেনা। এই গল্পেও লীলা মজুমদার প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে শিশুদের ভাবতে শেখান। ভূত বলেই যে ভয়ংকর হবে, সকলকে ভয় দেখাবে, এমন সকল ধারণাকেই লীলা মজুমদার বারবার নস্যাৎ করেন তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে। আর এখানেই তিনি হয়ে উঠেন বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের এক সার্থক নির্মাতা।

Reference:

১. মজুমদার, লীলা, 'লীলা মজুমদার রচনা সমগ্র' (তৃতীয় খন্ড), লালমাটি, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৫৭

২. তদেব, পৃ. ৩৩

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. তদেব, পৃ. ১৪০

৪. তদেব, পৃ. ১৪০

৫. তদেব, পৃ. ১৪০

৬. মজুমদার, লীলা, 'লীলা মজুমদার রচনা সমগ্র' (চতুর্থ খন্ড), লালমাটি, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩০৭

৭. তদেব, পৃ. ৫৯৯

৮. মজুমদার, লীলা, 'লীলা মজুমদার রচনা সমগ্র' (তৃতীয় খন্ড), লালমাটি, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩০৫

৯. তদেব, পৃ. ৪০৩

১০. তদেব, পৃ. ৫২

১১. তদেব, পৃ. ৫৪

১২. তদেব, পৃ. ১৭৮

১৩. তদেব, পৃ. ১৭৮